পাঠ একক - ১

দ্বিতীয় অংশ

রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্ক (The Patient-Doctor Relationship)

১.২.০ উদ্দেশ্য :

পাঠ এককের এই অংশে রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্ক ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ধারণা ও নিয়ম-নীতির আলোচনা করা হবে।

১.২.১ প্রাক্‌কথন :

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রে হিপোক্রাতীয় মডেলের মধ্যে বড় বেশি অভিভাবকগিরি (paternalism) সংশ্লিষ্ট রয়েছে। একজন ভাল চিকিৎসকই ঠিক করেন তাঁর রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থ কি, এবং একজন ভাল রোগী হল সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করেন। তবে বর্তমানে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণ (autonomy) এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। চিকিৎসককে রোগীর প্রতি কেবল আস্থাভাজন হলেই চলবে না, চিকিৎসকের আরো অনেক দায়িত্ব আছে, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার উপর নির্ভর করে। যাই হোক, এটা ধরে নেওয়া হয় যে রোগীর চিকিৎসা তখনই করা হয় যখন তা রোগীর রোগ উপশমে সহায়ক হয়। তবে রোগীর স্বার্থ কেবল শরীর-সম্বন্ধীয়ই নয়, বিশেষ ধরনের কিছু চিকিৎসা রোগীর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। কোনো চিকিৎসা রোগীর উপকারের তুলনায় অনেক বেশি বেদনাদায়ক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হিসাবে রোগ উপশমে যথেষ্ট উপকারী হওয়া সত্ত্বেও যেকোনো চিকিৎসা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রোগীর উপর বর্তায়, চিকিৎসকের উপর নয়।

এখন যে ব্যাপারটি সমস্যা সৃষ্টি করে সেটি হল, রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে এবং রোগীর জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদান (informed consent) -এর শর্ত মেনে চিকিৎসার ব্যবস্থার এমন কিছু ক্ষেত্র বা সুযোগ আছে কিনা যেখানে রোগীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে চিকিৎসক তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিকিৎসা করতে পারেন। রোগীর সবকিছু জানার অধিকারের কথা মাথায় রেখে ডাক্তারবাবু কি চিকিৎসাগত বিশেষ সুবিধা (therapeutic privilege) -র আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষতিকারক হতে পারে এমন কোনো চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখতে পারেন? এমন কিছু পরিস্থিতি আছে কি যেখানে রোগীর সম্বন্ধে গোপনীয় কোনো তথ্য ডাক্তারবাবু তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করতে পারেন? এইসব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক।

১.২.২ জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদান (Informed Consent) :

জ্ঞাতসারে সম্মতিদান রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতির বাস্তব প্রয়োগ। জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের ধারণাটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উত্থাপন করেন 'শোলেনডোর্ফ বনাম সোসাইটি অফ্ নিউইয়র্ক

Scanned with CamScanner

হসপিটালস্' কেসের বিচারক জাস্টিস কার্ডোজ। কার্ডোজ সুস্পষ্ট রায় দেন যে একজন রোগী চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানবে যার ভিত্তিতে রোগী সিদ্ধান্ত নেবে সে চিকিৎসা করাবে, নাকি তার থেকে বিরত থাকবে। স্বাধীনভাবে সম্মতি জানাতে গেলে রোগীকে অবশ্যই সুস্থ মনে থাকতে হবে এবং তার উপর কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। ১৯৬০ সালে 'নাটানসন বনাম ক্লাইন' কেসের মধ্যে দিয়ে জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদানের বিষয়টি আইনশাস্ত্রে যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের ধারণাটির দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য চিকিৎসক রোগীর কাছে খুলে বলবেন (doctor's disclosure)। এর মধ্যে থাকবে রোগ নির্ধারণ, রোগের চিকিৎসা কিভাবে করাতে হবে, লভ্য এবং বিকল্প চিকিৎসা, চিকিৎসার ঝুঁকি, চিকিৎসার উপকার এবং চিকিৎসা গ্রহণ করলে কি ফল লাভ হবে, আর চিকিৎসা অস্বীকার করলে তার কি পরিণাম হবে ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল সক্ষম রোগী (competent patient), যে এই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে চিকিৎসা করাবে, না কি করাবে না। একজন সক্ষম রোগী হল সেই যে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বোঝে এবং চিকিৎসা গ্রহণ করলে বা অস্বীকার করলে কি পরিণতি ঘটবে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। আদর্শগতভাবে, জ্ঞাতসারে সম্মতিদান চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে, যে সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ভিত্তিশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা একজন ক্যান্সার রোগীর কথা ভাবতে পারি যে কেমোথেরাপি নিতে অস্বীকার করছে। ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই রোগীকে কেমোথেরাপি নিতে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন এই কথা বলে যে এই কেমোথেরাপির মাধ্যমে তার ক্যান্সারের নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সম্ভব। এখন, সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম রোগী যখন সব কিছু জানার পরেও কেমোথেরাপি নিতে অস্বীকার করে তখন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে রোগীর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়। রোগী যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাইছে তা হল তার প্রাপ্তব্য উপকারের তুলনায় এই চিকিৎসার যে খরচ এবং কষ্ট তা অনেক বেশী। রোগী মনে করতে পারে, কেমোথেরাপির কষ্ট সহ্য করে তার জীবনকে কয়েক বছরের জন্য দীর্ঘায়িত করার কোনো মানে হয় না। রোগীর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান দিয়ে চিকিৎসক এখানে রোগীর স্বাতন্ত্র্য ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে শরীরের উপর হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করার অধিকারকে সম্মান জানাচ্ছে। এখানে সম্ভাব্য বিরোধের মীমাংসা হচ্ছে এই বিচারের মাধ্যমে যে রোগীর মঙ্গলসাধনে ডাক্তারের কর্তব্যকে রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নিষ্প্রভ করে দিতে পারে। রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে সম্মান করা ডাক্তারের পক্ষে রোগীর উপকার সাধনের কর্তব্যের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণরূপে দেখা দিচ্ছে।

অতঃপর, আমরা অপেক্ষাকৃত জটিল একটা দৃষ্টান্তের বিবেচনা করব। একজন সিজোফ্রেনিক রোগী যে ফুটপাথে বাস করে এবং মাঝে মধ্যেই যাকে মানসিক রোগের ঔষুধ খেতে হয়। এরকম একজন রোগী বুকে এবং হাতে ব্যথা নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হল। করোনারি ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনে বাধার সমস্যা ধরা পড়লে তার এ্যাঞ্জিওগ্রাম করার কথা উঠে। এই এ্যাঞ্জিওগ্রাম পদ্ধতিতে ধমনীর মধ্যে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ (dye) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর ধমনীর এক্স-রে নেওয়া হয়। ধমনীর রক্তসঞ্চালনের বাধা যেখানে রোগ সেখানে পরবর্তী সম্ভাব্য ধাপ হবে এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। এই প্রক্রিয়ায় পায়ে ফিমরাল ধমনীতে বড় সুঁচ দিয়ে ফুটো করা হয়। এই ফুটো দিয়ে অগ্রে-বেলুন-যুক্ত একটি ক্যাথিটার সমস্যাযুক্ত করোনারি আর্টারিতে প্রবেশ করানো হয়। ক্যাথিটারটা এমনভাবে সংস্থাপন করা হয় যাতে করে বেলুনটি বাধার কাছাকাছি থাকে। বেলুনটিকে কয়েক

Scanned with CamScanner

সেকেন্ড ধরে ফোলানো হয় যা ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে জমে থাকা পদার্থকে সরিয়ে দেয়। এর মধ্যে দিয়ে ধমনীর বাধাজনিত সমস্যা দূরীভূত হয়। এখন যে রোগীর কথা বলছি সে যদি শরীরের উপর আক্রমণকর (invasive) পদ্ধতি বলে এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করে তাহলে ডাক্তারবাবু কি করবেন? রোগী এ্যাঞ্জিওগ্রামে সম্মতি দিয়েছিল, কিন্তু এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অস্বীকার করছে। এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সঙ্গে হার্টএ্যাটাক এবং মৃত্যুর সামান্য ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু এই বাধা দূর করার চিকিৎসা না করানোর ঝুঁকি তার থেকে বেশি। রোগীর বর্তমান অবস্থা ও এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির উপকারিতা এই ঝুঁকিকে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করে।

কেউ দাবী করতে পারেন, রোগী মানসিকভাবে অসুস্থ, তাই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্মতি জানানোর মতো সক্ষম অবস্থাতে সে নাই। সুতরাং চিকিৎসক এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি চিকিৎসার ব্যাপারে রোগীর যে আপত্তি তা অস্বীকার করলে দোষের কিছু নাই। এই রোগী এ্যাঞ্জিওগ্রামকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অস্বীকার করছে। এটা নির্দেশ করে যে তার ব্যবহারের মধ্যে সংগতি নাই এবং তার ভাবনা-চিন্তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। তথাপি যখন সে ভর্তি হয়েছিল তখন সে মনোরোগী ছিল না এবং এই পদ্ধতিটা যে আক্রমণাত্মক ও বেদনাদায়ক প্রকৃতির তা বোঝার মতো সামর্থ্য তার আছে। কোনো ব্যক্তি দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত চিকিৎসার মূল্যায়নে যুক্তিহীন-এর থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য তার নেই। এখানে উপকার এবং স্বাতন্ত্র্যের একটা বিরোধ যথার্থই রয়েছে। এই ধরনের সমস্যা সমাধান কল্পে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে কোনো চিকিৎসা অস্বীকার করার জন্য যে স্তরের সক্ষমতা প্রয়োজন তা কম ঝুঁকি থেকে বেশী ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যাবে। চিকিৎসা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা যত বেশী হবে রোগীর সক্ষমতার মাত্রা তত বেশী হওয়া উচিত। যখন একজন রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত রোগীকে তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় তখন রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সামর্থ্যের মাত্রাও উচ্চস্তরের হবে। এরকম ক্ষেত্রে রোগী যদি সেই মাত্রায় পৌঁছাতে না পারে তাহলে চিকিৎসকের অভিভাবকগিরি রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের গুরুত্বকে অর্থহীন করে দেয় এবং সেক্ষেত্রে চিকিৎসার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা যৌক্তিকতা পেয়ে যায়। সাধারণভাবে রোগীর সক্ষমতার মাত্রা যত কম হবে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ না করলে ঝুঁকি যত বাড়বে ডাক্তারের পক্ষে রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা তত বেশী যুক্তিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিপরীতভাবে, রোগীর সক্ষমতার মাত্রা যত বেশী হবে, এবং চিকিৎসা না করানো জনিত ঝুঁকি যত কম হবে, রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত বেশী যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে। তবে অনেকে সক্ষমতার মাত্রার উপর স্বাতন্ত্র্য ও সম্মতিকে ভিত্তিশীল করার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের যুক্তি, ন্যূনতম সক্ষমতাই রোগীর কোনো চিকিৎসা গ্রহণ বা বর্জন করার ব্যাপারে যথেষ্ট। যদি কোনো রোগী চিকিৎসা গ্রহণে যথেষ্ট সক্ষম হয় তাহলে সে তার প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারেও যথেষ্ট সক্ষম হবে।

তথাপি সামর্থ্য এবং ঝুঁকির অতিরিক্ত তৃতীয় আর একটি মাত্রা রয়েছে এবং সেটি হল চিকিৎসা-পদ্ধতির আক্রমণাত্মক দিক (invasiveness)। সিজোফ্রেনিক রোগী জানে তার শরীরের উপর কিরূপ বহিরাক্রমণ সংগঠিত হতে যাচ্ছে — এবং এই ভেবেই সে আপত্তি জানায়। এখানে সে তার দেহের উপর অনাক্রমণের অধিকার প্রয়োগ করছে। ধরে নেওয়া যাক যে এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কি কি সুবিধা-অসুবিধা সেগুলি সম্পর্কে রোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। যদি সে দেহের প্রতি আক্রমণাত্মক ভেবে চিকিৎসা

Scanned with CamScanner

নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানায় তাহলে তার স্বাতন্ত্র্যের নীতিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যাই হোক, এটা স্বীকৃত যে সক্ষমতার ন্যূনতম মাত্রা পরিলক্ষিত হলে চিকিৎসক রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের রক্ষাকে সম্মান জানাতে বাধ্য। কিন্তু যখন রোগী চিকিৎসা নিতে চাইবে তখন কি এই একই যুক্তি প্রযোজ্য হবে?

স্বাস্থ্যের উপকারী এমন চিকিৎসা অস্বীকার করার অধিকারের অর্থ এই নয় যে যেকোনো ধরনের চিকিৎসা রোগী চাইতে পারে। সাধারণভাবে রোগীর কোনো অধিকারকে চিকিৎসক সম্মান করতে বাধ্য। তবে রোগীর চিকিৎসা দিতে চিকিৎসক তখনই এবং চিকিৎসা পেতে রোগীর অধিকার তখনই স্বীকৃত হয় যখন চিকিৎসাজাত কিছু উপকারের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবে তা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া এবং রোগীকে সাধারণ-কর্মক্ষমতায় ফিরিয়ে দেওয়া চিকিৎসার লক্ষ্য। যে রোগীর লাং-ক্যান্সার শেষ স্তরে পৌঁছেছে সে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR) অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু রোগীর অবস্থা খুবই সংকটময় সেহেতু CPR-এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা বা জীবনকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব নয়। তাই এই ব্যবস্থা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। এই যুক্তিতে চিকিৎসক রোগীকে CPR দিতে বাধ্য নয়। একই রকমভাবে ডাক্তারবাবু সেইরকম রোগীর জীবনদায়ক যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে বাধ্য নয়, যা তার পেশাগত বিচারে রোগীর কোনো মঙ্গল করবে না। একজন ব্রেন-ডেড্ রোগীকে রেস্পেরিটারের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দৃষ্টান্তটি এখানে বিবেচ্য হতে পারে।

অধিকন্তু, যখন কোনো রোগী তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয় তখন তার হয়ে উপযুক্ত কোনো প্রতিনিধি (surrogate) সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোগীর হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি এই দু'রকম উপায়ের মধ্যে যেকোনো একরকম ভাবে কাজ করতে পারে : (১) সে চিকিৎসা সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা রোগী সমর্থ থাকলে নিত। এক্ষেত্রে রোগীর বিচারেরই প্রতিফলন ঘটে। (২) প্রতিনিধি এমন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা সে বিশ্বাস করে যে রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূল। এই ব্যবস্থার আরেকটি বিকল্প হল বাঁচার ইচ্ছা জাতীয় কোনো পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশের (advance directive) মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। এইভাবে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী রোগী, যে সময়ের জন্য সে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়, সেই সময় পর্যন্ত তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বর্ধিত করতে পারে। এই প্রদত্ত নির্দেশনা দুটো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে : ১) রোগী চিকিৎসককে দিয়ে কি করাতে চায় তা প্রকাশ পায়। ২) রোগী চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো ব্যক্তিকে অধিকার দিতে পারে। অবশ্য এই নির্দেশনার বিষয় ও শর্তাদি নিয়মিতভাবে আপডেট করা বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনা যদি না থাকে তখন রোগীর কোনো প্রতিনিধিকে আদালত নিযুক্ত অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব কিছুর মাধ্যমে এটাই বেরিয়ে আসে যে রোগীর পক্ষে সর্বোত্তম স্বার্থ কি তা চিকিৎসকের নির্ধারণ করার বিষয় নয়। তবে এমন কিছু আপদকালীন পরিস্থিতি আছে যেখানে রোগীর সম্মতির প্রশ্ন ওঠে না। যেমন, যখন সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ কোনো রোগীকে ইমার্জেন্সি রুমে আনা হয় তখন পরিস্থিতির আপদকালীনতাই নির্দেশ করে যে রোগীকে চিকিৎসা করাতে হবে। এই জরুরী পরিস্থিতিতে ডাক্তার, রোগী বা তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিচার-বিমর্শ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এখন, আমরা শিশুদের প্রসঙ্গে আসব। পিতামাতাই শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের সব থেকে ভাল বিচারক এবং পিতামাতা তার চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিশুর অপব্যবহার বা অবহেলার সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে

Scanned with CamScanner

পিতামাতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হতে পারে। অন্য দিকে, ধর্মীয় ভিত্তিতে চিকিৎসা অস্বীকার করা একটি নতুন সমস্যাকে তুলে ধরে। যেমন লিউকোমিয়া চিকিৎসার জন্য ব্লাড-ট্রান্সফিউশন ছাড়া রোগী মারা যাবে ভেবে ডাক্তারবাবু আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং আদালত যদি প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় তাহলে তখন ডাক্তারবাবু রোগীর পিতামাতার ব্লাড-ট্রান্সফিউশন অস্বীকার করার ঘটনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। সাধারণভাবে শিশুদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতার সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায়। কিন্তু নিছক ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে পিতামাতা যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে রোগীর স্বাস্থ্য ও জীবনের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্র বা স্থানীয় আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। পিতামাতা কোনো বিশেষ ধরনের বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু তাদের শিশুদের মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

অবশ্য আরো কিছু জটিল ক্ষেত্র আছে যেখানে চিকিৎসা শুরু করা বা বন্ধ রাখা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে অভিভাবকগিরি এবং রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসেবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। একজন রোগী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য জানার পরেই কি করা উচিত সে সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তে পারে। তখন তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিকিৎসককে অনুরোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাকৃত অনুরোধকে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ বলেই মনে করা হবে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ তথা চিকিৎসক রোগীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি কখনও কখনও এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এতটাই যুক্তিহীন ব্যবহার করে যে তারা ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার রোগী তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা চিকিৎসকের উপরেই সঁপে দিতে চায়। এক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রতি রোগীর আস্থা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অধিকন্তু, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রোগীর উপর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটি চিকিৎসককে একজন নিরাসক্ত পেশাদার হিসেবে চিত্রিত করে, যা মোটেই কাম্য নয়। বরং রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের যৌথ আলোচনার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়।

আমরা যদি সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করি তাহলে দেখব জ্ঞাতসারে সম্মতির পাঁচটি উপাদান রয়েছে : (রোগীর) সামর্থ্য (competence), (রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের) সব কিছু খুলে বলা (disclosure), (বাস্তব অবস্থাকে) ঠিকমতো বুঝতে পারা (understanding), ঐচ্ছিকতা (voluntariness) এবং সম্মতি (consent)। নীচের উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব : "An informed consent is an individual's autonomous authorization of a medical intervention or of participation in research." (বোশাম্প অ্যান্ড চিলড্রেস, পৃঃ ৭৮)

১.২.৩ চিকিৎসাগত বিশেষ অধিকার (Therapeutic Privilege) :

চিকিৎসকের একটা নৈতিক দায় আছে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য রোগীকে জানানো, যার উপর ভিত্তি করে রোগী তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই দায়বদ্ধতা কর্তব্যবাদী এবং পরিণামবাদী এই উভয় ধরনের যুক্তির উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তথ্য রোগীর কাছে

Scanned with CamScanner

প্রকাশ করার অর্থ রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে সম্মান জানানো এবং এর মধ্য দিয়েই রোগী তার পক্ষে উপকারী চিকিৎসার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখানে যে রোগীর কাছে যে তথ্য প্রকাশের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে রোগীর বর্তমান অবস্থা, উপযুক্ত চিকিৎসা নিলে কি উন্নতি হবে, সম্ভাব্য আর কি ধরনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে, এবং এই ধরনের হস্তক্ষেপের ঝুঁকি এবং সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য থাকবে। জ্ঞাতসারে সম্মতির জন্য এই তথ্যের প্রকাশ আবশ্যিক।

কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের প্রকাশ উপকারের তুলনায় বেশী ক্ষতি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা মঙ্গলজনক প্রতারণা (beneficent deception) -র সাহায্য নিলে তা কি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য হবে? রোগীর পক্ষে সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন তথ্য চিকিৎসকের গোপন করার বিষয়টিকে পেশাগত বা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অগ্রাধিকার (therapeutic priviledge) বলে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে যে সত্য যতই কঠিন হোক না কেন, অধিকাংশ রোগীর কাছে তা প্রকাশ করা উচিত। অভিভাবকসুলভ যুক্তি ব্যবহার করে রোগীকে প্রতারণা করা উচিত নয়। ডাক্তারের সাথে আস্থার সম্পর্ক রোগীর অনেক উপকার করতে পারে এবং তথ্য প্রকাশে সততা রোগীর আস্থা-অর্জনকে উৎসাহিত করবে। তবে রবার্ট ভীচ (Robert Veatch) চিকিৎসক-সুলভ বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে প্রধান দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। প্রথমতঃ, তথ্যের প্রকাশ রোগীর কতটা ক্ষতি করবে বা তথ্য গোপন করার ফলে রোগীর কতটাই বা সুবিধা হবে - এ ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে চিকিৎসক ভুল করতে পারেন, বা চিকিৎসক বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য গোপন রাখলে রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করা হয় না এবং এতে সততা ও বিশ্বস্ততার যে কর্তব্য চিকিৎকের আছে তা পূর্ণতা পায় না। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একজন সক্ষম রোগী চিকিৎসা সম্পর্কে সব কিছু জেনেশুনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সামনে থাকলে তবেই রোগী এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে। রোগীর যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য জানার অধিকার এবং একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে যাতে করে তারা চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথার্থ অংশগ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসকের পেশাগত বিশেষ সুবিধা রোগীর এই অধিকারকে লঙঘন করে। তাই চিকিৎসকের এই বিশেষ সুবিধার ধারণার পেছনে কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা নেই। আমাদের মনে হয় রোগীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে সামনে রেখে এমন এক সিদ্ধান্তকারী যুক্তি এখানে প্রয়োজন হয় যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চায় না -এই দাবীকে প্রতিপন্ন করে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য গোপন রাখার ধারণাটি পরিণামবাদী যুক্তিতেও প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রতারণার চেয়ে সততা ভাল। কোনো চিকিৎসক তথ্য গোপন করে রোগীকে প্রতারণা করছে প্রমাণিত হলে তা চিকিৎসকের ওপর রোগীর আস্থাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ঘটনা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে রোগীকে নিরুৎসাহিত করতে পারে, অথবা চিকিৎসায় রোগী কিভাবে সাড়া দিচ্ছে তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতারণা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবলে যেসব চিকিৎসক ক্রমাগতভাবে রোগীদের প্রতারণা করেন তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হতে পারে। একই সঙ্গে চিকিৎসা পেশার ক্ষতি হতে পারে। সেরূপ হলে অনেক রোগীই চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং এর ফলে রোগীর আরও ক্ষতি হবে।

Scanned with CamScanner

এতৎসত্ত্বেও, একজন চিকিৎসক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য একেবারেই সব রোগীর কাছে জানিয়ে দিতে কি দায়বদ্ধ? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা এমন এক রোগীর কথা ভাবতে পারি যার মানসিক রোগের পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে এবং বর্তমানে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। এরকম রোগীকে ডাক্তার কি জানাবে, কিভাবে জানাবে না তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আমাদের মনে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে এমন এক উপায় বের করতে হবে যা একদিকে চিকিৎসকের পেশাগত বিশেষ অধিকার এবং রবার্ট ভীচের সব কিছু প্রকাশ করার যুক্তি উভয় দিককে সমানভাবে গুরুত্ব দেবে। চিকিৎসক রোগীকে ধাপে ধাপে মেপে-বুঝে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করবেন, যাতে রোগী সেগুলি যথার্থ অনুধাবন করতে সময় পায় এবং বিকল্প চিকিৎসার সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য প্রকাশ করবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে তা যেন বিভ্রান্তিকর না হয়। আরও বিশেষভাবে বললে, কেমোথেরাপির কোনো একটি কোর্স রোগীর জীবনকে যদি তিন থেকে পাঁচ বছর দীর্ঘায়িত করার ৬০ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে রোগীকে বলা যেতে পারে তার ক্যান্সার হয়েছে, তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় (রোগ একেবারে সেরে যাবে-একথা না বলে)। বেশ কয়েক দিন পর দ্বিতীয়বার রোগী চেম্বারে এলে চিকিৎসক তার চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাষায় আলোচনা করতে পারেন। রোগ-নির্ণয় এবং চিকিৎসার গতিপ্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা রোগীকে এই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিতে সাহায্য করে। এখানে সাধারণ সমস্যাটি হল, কি পরিমাণ তথ্য রোগীর কাছে কিভাবে প্রকাশ করা হবে তা সব তথ্যকে প্রকাশ করতে হবে -এই নীতির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন রোগ নির্ণয় করা গেছে তখন যাবতীয় তথ্যের প্রকাশ না করাটা অমঙ্গলজনক প্রতারণা হিসাবেই বিবেচিত হবে। চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, একজন রোগী মাথাব্যথার সমস্যা, স্মৃতিভ্রংশ, দ্বিধাগ্রস্ততা এবং বমিবমিভাব নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এসেছে। সি.টি. স্ক্যান (C T Scan) করে জানা গেল যে রোগীর ব্রেন টিউমার হয়েছে। নিউরো সার্জেন রোগীকে এই সম্পর্কে জানায় এবং উপদেশ দেয় যে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে টিউমারটিকে বের করতে হবে। রোগী তখন শল্য-চিকিৎসার সম্মতি দেয়। শল্যচিকিৎসার পরবর্ত্তী পর্যায়ে ঐ নিউরোসার্জেন রোগীকে জানাতে পারে না যে কি ধরনের টিউমার তার ছিল। টিউমারটা ক্ষতিকারক, না কি ক্ষতিকারক নয় এবং টিউমারের সবটুকুই সার্জারির মাধ্যমে বের করা গেছে, না কি আংশিকভাবে বের করা গেছে - এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চিকিৎসার অগ্রগতি নির্ভর করবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগী চিকিৎসার অগ্রগতির নিরিখে কি সিদ্ধান্ত নেবে তা স্থির করা খুবই কঠিন। যখন রোগ নিরাময়ের জন্য বেশী সময় আর অবশিষ্ট নেই, তখন তাড়াতাড়ি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিকিৎসক সব কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য খুলে বলতে দায়বদ্ধ।

সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই নীতিতত্ত্বে এমন কোনো নীতি নেই যার ভিত্তিতে সততা (honesty) এবং দয়ামায়া (compassion) - এ দুই আপাত-বিরুদ্ধ সদ্‌গুণের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া যাবে। কিন্তু চিকিৎসক কিভাবে রোগীর কাছে তথ্যগুলি প্রকাশ করছে তার গুরুত্ব এটা দেখিয়ে দেয় এই দুটি সদ্‌গুণ আবশ্যিকভাবে বিরোধী নয়, বরং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নিখুঁতভাবে রোগীর রোগ সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেওয়াই চিকিৎসকের উচিত কাজ - এরকম নয়। রোগীর আবেগ-অনুভূতির কথা মাথায় রেখে যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

তথ্য প্রকাশ করতে পারে। সততা এবং দয়ামায়া দুয়ের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গেলে সততাকে ব্যাপক অর্থে বোঝা দরকার। অল্প অল্প করে ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করা অসততা নয়। এই দিক থেকে রোগীর চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যের ধারণা যত্নবান চিকিৎসকের গুরুত্বকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। চিকিৎসকও একজন রক্তমাংসের ব্যক্তি, যার মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি সব কিছুই আছে। তাই, শুধুমাত্র তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা থেকে হঠাৎ করে প্রথম ভিজিটেই সব কিছু এক সাথে জানিয়ে দেওয়া যথোচিত নাও হতে পারে। চিকিৎসকের মধ্যে জ্ঞান, সততা এবং দয়ার্দ্রচিত্ততার মেলবন্ধন আবশ্যিক।

১.২.৪ গোপনীয়তা রক্ষা (Confidentiality) :

চিকিৎসকের রোগীর কাছে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করার যেমন কর্তব্য আছে, ঠিক তেমনি তৃতীয় পক্ষের কাছে এসব তথ্যকে প্রকাশ না করার ব্যাপারেও তিনি দায়বদ্ধ। এই ধরনের তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশ করা চিকিৎসকের বিশ্বস্ততা তথা গোপনীয়তা রক্ষা করার নীতিকে লঙঘন করে, যা রোগী চিকিৎসকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত নয়। চিকিৎসক যখন কোনো একজন বিশেষ রোগী সম্পর্কে তথ্য কেবল সংশ্লিষ্ট রোগীর কাছেই প্রকাশ করে তখন বলা হবে বিশ্বস্ততা তথা গোপনীয়তা রক্ষিত হচ্ছে। রোগীর অনুমতি ভিন্ন রোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ না করতে চিকিৎসক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রোগীদের সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করা চিকিৎসকের দায়িত্ব -এই অভিমতের পক্ষে দু'ধরনের যুক্তি আছে। প্রথমটি হল কর্তব্যবাদী যুক্তি, যার মধ্যে রোগীর স্বাতন্ত্র্য ও গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা সংশ্লিষ্ট আছে। গোপনীয়তা আসলে রোগীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র। রোগীর অনুমতি ব্যতিরেকে তথ্য প্রকাশ করা এই অধিকারকে লঙঘন করে এবং একই সঙ্গে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অসম্মান করে। দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিটি পরিণামবাদী। যদি চিকিৎসক রোগী সম্পর্কে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য প্রকাশ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের প্রতি রোগীদের আস্থা ক্রমশ কমে যাবে। রোগী তখন চিকিৎসাগত যত্ন নেওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে গোপনীয়তার আশ্বাস না পেলে রোগী তার নিজের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্য চিকিৎসককে খুলে বলতে দ্বিধা করবে এবং এর ফলে চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নিরূপণ করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

কিন্তু যেখানে রোগীর নিজের বা অপর কোনো ব্যক্তির প্রাণহানি রূপ বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে পরিণামবাদী যুক্তিতে গোপনীয়তা রক্ষার বিধি লঙঘন করা যেতে পারে। ক্যালিফোর্ণিয়া সুপ্রীম কোর্ট 'তারাসফ বনাম ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ' (Tarasoff vs. Regents of the University of California) কেসে গোপনীয়তা রক্ষার বিধিকে বৃহত্তর পরিস্থিতিতে লঙঘন করা যেতে পারে বলে রায় দেয়, যদিও রায় দেওয়ার আগে দু'দল বিচারকের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা গিয়েছিল। ঘটনাটি এরকম : ১৯৬৯ সালের ২৭ শে অক্টোবর মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া শহরে তাতিয়ানা তারাসফ নামে এক যুবতী খুন হয়। খুনীর নাম প্রসেনজিৎ পোদ্দার, মানসিক ভারসাম্যহীন এক ভারতীয় তরুণ যে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লরেন্স ম্যুরের চিকিৎসাধীন ছিল। তারাসফের পরিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা ডঃ

Scanned with CamScanner

ম্যুরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। তাদের অভিযোগ ছিল : খুনের ঘটনার মাস দু'য়েক আগে প্রসেনজিৎ যখন ম্যুরের চিকিৎসাধীন ছিল তখনই সে তাতিয়ানাকে খুন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। অথচ ডঃ ম্যুর এর বিন্দুবিসর্গ তাতিয়ানার বাড়ির লোকজনকে জানান নি, স্থানীয় পুলিশকেও না। তাতিয়ানার পরিবারের বক্তব্য ছিল, ম্যুর যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতেন তাহলে তাতিয়ানাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না। এই মামলা প্রায় সাত বছর ধরে চলেছিল। এই যে লম্বা আইনি বিতর্ক তার মূলে ছিল দুটি ভিন্ন বিধির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে। একটি ছিল গোপনীয়তা রক্ষা (confidentiality)-র বিধি, যার মূল কথা রোগীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে চিকিৎসক যা কিছু জানবেন তা গোপন রাখবেন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে জানাবেন না। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার সাধারণ (protecting persons from violent assault) বিধি, যদনুসারে, যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন কারোর প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দেবে তখন অন্য যেকোনো বিধির তুলনায় জীবনরক্ষার বিধি বেশি গুরুত্ব পাবে। আদালত এই দুই বিধি সম্পর্কে রায় দিতে গিয়ে তাতিয়ানার পরিবারের পক্ষ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানান, "The protective privilege of confidentiality ends where public peril begins." প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা রোগীর তথ্যের গোপনীয়তা বিধি এবং যে কর্তব্যবাদী যুক্তির উপর এই বিধি নির্ভরশীল তাকে লঙঘন করাই বাঞ্ছনীয়। পরিণামবাদী যুক্তিতে, যুবতীর উপর সরাসরি প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস হারানোর সাধারণ পরোক্ষ ক্ষতিকে ছাপিয়ে যায়। এখানে সরাসরি বড় ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধ করার পক্ষে যে কর্ম-পরিণামবাদী যুক্তি তা পরোক্ষ ঝুঁকির নিয়ম-পরিণামবাদী যুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

আরো একটা দৃষ্টান্ত বিচার করা যেতে পারে : একজন HIV-Positive রোগী, যার AIDS -এর সম্ভাবনা আছে। রোগ-নির্ণয়ের পর ডাক্তারবাবু রোগীকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার পর অনুরোধ করলেন যে তার যৌনসঙ্গীকে বিষয়টি জানাতে। কিন্তু রোগী তা করতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে ডাক্তারবাবুকেও বারবার অনুরোধ করে তার সঙ্গীকে ঘটনাটি না জানাতে। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে যাবে — এই আশঙ্কায় রোগী তার জীবন-সঙ্গীকে একথা বলতে পারছে না। ডাক্তারবাবু রোগীকে বুঝিয়ে বলেন যে এতে দু'জনের ভাল হবে। কিন্তু কাজ হয় না, রোগী অবুঝের মতো আচরণ করতে থাকে। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু কি গোপনীয়তা রক্ষার বিধি লঙঘন করে ঐ রোগীর সঙ্গীকে সরাসরি জানিয়ে দিতে পারেন, এবং জানিয়ে দিলে তা কি নৈতিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে?

একজন HIV- পজিটিভ রোগী সম্বন্ধে কোনো তথ্য তার অনুমতি ছাড়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা তখনই নৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত হবে যখন কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে যৌন-সঙ্গীকে রোগটির কথা না জানালে তার ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ ডাক্তারবাবু এখানে রোগীর সঙ্গীকে ঐ তথ্য জানাতে পারেন এবং কর্ম-পরিণামবাদের দৃষ্টিতে তা যুক্তিযুক্ত হবে। সামগ্রিক বিচারে এখানে যে মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার আছে তা গোপনীয়তা রক্ষার বিধিকে অতিক্রম করে যায়। তাছাড়া, পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কায় যে রোগী তার HIV- স্টাটাস সম্পর্কে সঙ্গীকে জানাতে অস্বীকার করছে সে একই সঙ্গে সঙ্গীর কল্যাণের ব্যাপারটি অস্বীকার করছে। এই বিষয়টি গোপনীয়তা ভঙ্গ করার পক্ষে বাড়তি সমর্থন যোগায়।

Scanned with CamScanner

পরিশেষে বলা যায়, যদিও ডাক্তারবাবুর প্রাথমিক দায়িত্ব তার রোগীর প্রতি, তথাপি যদি তাঁর রোগীর কোনো আচরণ সমাজের অন্য কারোর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরী করে তখন ডাক্তারবাবুর দায়িত্ব ব্যক্তি রোগীকে অতিক্রম করে সমাজের কাছে পৌঁছে যাওয়া। অন্য মানুষজনকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে রোগীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিধিতে ব্যতিক্রম স্বীকার করা উচিত। ওয়াল্টার গ্লানলের ভাষায়' "The deontological constraint on breaching confidentiality may be overridden by this consequentialist line of reasoning."

১২.৫ আন্তঃ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক (Cross-cultural relations) :

ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও ঐতিহ্যের কারণে চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মতবিরোধ তৈরি হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মানুষের মধ্যে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্য, উপকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধরা যাক, একজন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোনো রোগীকে কেমোথেরাপি নিতে পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারবাবু এই ভেবে কেমোথেরাপি সুপারিশ করেছেন যে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্ততঃ আরো কয়েক বছরের জন্য জীবনটা দীর্ঘায়িত করা। ক্যান্সারের রোগীর বিশ্বাস, অবশিষ্ট জীবনের গুণগত মানই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এজন্য সে কেমোথেরাপি প্রত্যাখ্যান করছে। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত চিকিৎসকদের জীবনের লক্ষ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশ্বাস তা অন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা রোগীদের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র। জীবন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা হওয়ার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকের সঙ্গে অন্য কোনো সমাজের রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ভুলবোঝাবুঝি ঘটতে পারে। ডাক্তারবাবু তাঁর পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রোগীর চিকিৎসার জন্য যা যা করা উচিত তা করতে বলেন। কিন্তু রোগী অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না শুধু একারণে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।

চিকিৎসা-নীতিবিদদের মতে এই ধরনের বিরোধের মীমাংসা নির্ভর করছে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যার উপর। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে এটা হামেশাই লক্ষ্য করা যায় যে রোগী নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন পরিবারের অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। যদিও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদারনৈতিক ভাবনার সঙ্গে এটা মেলে না, তথাপি আমাদের এই আচরণকে স্বাতন্ত্র্য এবং সম্মতির ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পরিবারতন্ত্রে আমরা এরকম লক্ষ্য করি যে সমগ্র পরিবারের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিবারের এক সর্বময় কর্তা। যাই হোক, এক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে।

বিশ্লেষণকল্পে আমরা এমন একজন পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের কথা ভাবতে পারি যিনি নোভাজো সম্প্রদায় (Novajo community) -এর মধ্যে কাজ করেন। তাঁর একজন রোগী নোভাজো সম্প্রদায়ের মানুষ যে উচ্চরক্তচাপের জন্য কোনো রকম ঔষধ খেতে অস্বীকার করছে। ডাক্তারবাবু এর ফলে স্ট্রোক হওয়া, কিডনি ফেলিওর ইত্যাদি ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করান এই ভেবে যে এতে রোগী চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে আগ্রহী হবে। কিন্তু ঝুঁকির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ডাক্তারবাবু রোগীর মধ্যে চিকিৎসার নঞর্থক ধারণা তৈরী করে দিতে পারেন যা রোগীকে ডাক্তার দেখাতে নিরুৎসাহিত করতে পারে। নোভাজো সংস্কৃতিতে চিকিৎসার

Scanned with CamScanner

অর্থ বৈষম্যের নঞর্থক অবস্থা থেকে সুষম সদর্থক অবস্থার দিকে যাত্রা। এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে ডাক্তারবাবু রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ডাক্তারবাবু তাঁর পেশাকে সংস্কৃতি-ভিত্তিক করতে প্রয়াসী হবেন। এক একটা সংস্কৃতির বা ঐতিহ্যের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে না। এখানে যেটুকু ইঙ্গিত তা হল চিকিৎসক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন।

রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি অনুসারে একজন রোগীর অধিকার আছে যেকোনো চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যেকোনো ধরনের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রোগীর আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো রোগী যদি এসে বলেন তার শরীর থেকে দুষ্ট আত্মা বা ভূত তাড়ানোর জন্য তার একটি অঙ্গচ্ছেদ করা হোক। ডাক্তারবাবু কখনোই একাজ করতে পারেন না, কারণ তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শিক্ষা তাকে শিখিয়েছে যে এতে রোগীর ক্ষতি হবে। কারোর ক্ষতি না করা চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান নীতি, যা চিকিৎসককে মেনে চলা বাধ্য। তাই, চিকিৎসার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বাইরে কোনো রোগী যদি কোনো কিছু করতে বলেন তাহলে তা করার কোনো দায় চিকিৎসকের নেই। ডাক্তারবাবু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কারণে কোনো রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করাকে সম্মান জানাতে পারে, যদিও তার ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে। কিন্তু রোগীর ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো অনুরোধ কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকবেন, তা সে অনুরোধের পিছনে যাই যুক্তি থাকুক না কেন।

১.২.৬ কি ধরনের চিকিৎসক আমাদের প্রয়োজন? (What sort of doctors do we need?) :

যখন আমরা কোনো রোগ নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই তখন আমরা তার চিকিৎসা-সামর্থ্য, সহানুভূতি এবং দয়ার্দ্রচিত্ততা আশা করি। তবে যখন জীবন-সংশয়ের অবস্থা তখন আমরা ডাক্তারের রোগ সারানোর উপর বেশী গুরুত্ব দিই। রোগীর অবস্থা যত বেশী সংকটাপন্ন হবে চিকিৎসকের সক্ষমতা তত বেশী গুরুত্ব পাবে। জীবনসংশয়কারী কোনো আঘাত নিয়ে যদি আমাকে জরুরী বিভাগে আনা হয় তখন চিকিৎসকের সামর্থ্যটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, দয়ামায়া কম গুরুত্ব পায়। কিন্তু আমি যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী অথচ নিয়ন্ত্রিত কোনো রোগ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাই তখন তাঁর সহানুভূতি ও দয়ামায়া সামর্থ্যের থেকে অধিক গুরুত্ব পাবে। সাধারণভাবে, সামর্থ্য এবং দয়ার্দ্রচিত্ততা উভয় গুণই চিকিৎসকের থাকা উচিত। কিন্তু ডায়াবেটিসের মতো কোনো রোগ বা বার্ধক্যজনিত কোনো স্থায়ী রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে সহানুভূতির সঙ্গে চিকিৎসা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও রোগ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিশেষ সামর্থ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

এর থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে কি ধরনের চিকিৎসা আমরা চাই বা চিকিৎসকের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ আমরা দেখতে চাই তা নির্ভর করে আমাদের প্রয়োজনের প্রকৃতির উপর। আবার চিকিৎসকরা সর্বাবস্থায় পরার্থবাদী হবেন এই ভাবনা যথার্থ নয়। পরার্থবাদের মধ্যে স্বতন্ত্র কর্তব্য বা দায়িত্বের বোধ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর রোগীর প্রতি পেশাগত কর্তব্য থাকে এবং সেই কর্তব্য পালন করা নিছক পছন্দের ব্যাপার নয়। ডাক্তারবাবু ইচ্ছা করলে রোগীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু তা ডাক্তারবাবুর ইচ্ছা-নির্ভর। কিন্তু রোগী হিসেবে রোগীর সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কে চিকিৎসক যখন সম্পর্কিত হন তখন পেশাগত বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব

Scanned with CamScanner

কর্তব্য থাকে। যখনই কেউ ডাক্তার হন তখনই তিনি রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থ দেখার জন্যই অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই এটি পেশাগত বাধ্যবাধকতা। আবার কেউ মনে করতে পারেন, অসুস্থ বা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর কিছু আবদার অনুরোধে চিকিৎসকদের মুক্ত মনে সাড়া দেওয়া উচিত। চিকিৎসানীতিশাস্ত্র অনুসারে রোগীর সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটানো বা রোগীর পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হওয়া মহত্ত্বের কাজ হতে পারে যা রোগীর ভয়-বেদনা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু, ডাক্তারবাবুর এই কাজ ঐচ্ছিক, যেকোনো চিকিৎসক তা করতে পারেন। কিন্তু এরূপ করতে কোনো চিকিৎসক দায়বদ্ধ নয়। অধিকন্তু, কোনো একজন রোগীর সঙ্গে বেশী সময় অতিবাহিত করলে যদি অন্য রোগীর প্রতি মৌলিক কর্তব্যে গাফিলতি হয় তাহলে চিকিৎসকের এরকম আচরণ অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে।

Scanned with CamScanner